যায়যায়দিন

31 OCT 2007

এইচএসসি ২০০৭-এর রেজাল্ট থেকে শিক্ষণীয়

গত ২৬ আগস্ট ২০০৭-এ দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল একযোগে প্রকাশিত হলো। দেশের মোট ৭টি বোর্ডের ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ২০৫ জন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার স্বল্পতম সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৫৯ দিনের মাথায় এ ফলাফল প্রকাশিত হলো। আমার যতোটুকু মনে পড়ে এর আগে গত ২৩/৮/২০০৭-এ এই ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। তবে অনিবার্য কারণে তা পেছানো হয়। তাহলে ফল আমার মনে হয় ৫৬ দিনের মাথাতেই প্রস্তুত ছিল।

ফল প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ ফলাফল নিয়ে খুবই খুশি, আবার কেউ খুবই অখুশি- এমনকি কান্নার রোলও পড়ে গেল। পরীক্ষার ফল খারাপ হলে এ রকম কান্নার রোল পড়ে। কিন্তু বিপত্তিটা দেখা দেয়, তখনই যখন দেখি এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া, ট্যালেন্টপুলে প্রাথমিক এবং জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত কোনো ছেলে বা মেয়ে ফেল করে। আবার সেটাও হয়তো মেনে নেয়া যায় এই ভেবে যে- আগের রেজাল্ট ভালো হলেই পরের রেজাল্টও ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই। অথবা এমনও হতে পারে- শিক্ষার্থী আগে যেভাবে লেখাপড়া করেছে, এইচএসসিতে সেভাবে করেনি। উপযুক্ত যুক্তিগুলোর কোনোটিই অগ্রাহ্য করা যাবে না। তবে পরীক্ষার্থীদের মতামত ভিন্ন। তাদের কারো কারো বক্তব্য তারা কোনোভাবেই অকৃতকার্য হতে পারে না। এসব কথাতেও না হয় গুরুত্ব নাই দেয়া গেল। কিন্তু পরের দিন পত্রিকায় যখন দেখা গেল পরীক্ষকের ভুল আর অসতর্কতার কারণে পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন- তখন তো অনেকের মতোই ভাবতে বাধ্য হলাম- পরীক্ষার্থীরা যা বলছে তা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়, তাদের কথা কিছুটা হলেও আমলে নেয়ার যোগ্য। তাই আজ আমাদের ভেবে দেখা দরকার পরীক্ষার্থীরা কি বলছে? পত্রিকায় কি আসছে? শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় কি বলছেন? শিক্ষা বোর্ডের কমপিউটার কেন্দ্রের সিস্টেম অ্যানালিস্ট সাহেব কি বলছেন? কমপিউটার কেন্দ্রের চেয়ারম্যান মহোদয় কি বলছেন? পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয় কি বলছেন? পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষক কি বলতে চান?

পত্রিকায়ই প্রকাশ পেল- কোনো কোনো অনৈতিক পরীক্ষক পরীক্ষার খাতা গ্রহণ করে তা তাদের ছাত্রদের দিয়ে দেখান। এ ব্যাপারে হয়তো এখন কথা আসবে এরা কি শিক্ষক? আর শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিরুপায়ের মতোই উত্তরও হয়তো আসবে- হ্যা এরাই সেই হতভাগ্য শিক্ষক। যারা আপনাদের বংশধরদের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়ে আসছেন, তাদের কোনো দোষ-ত্রুটি নেই এমন দাবি করা যাবে না, তবে তাদের বেশির ভাগের মাসের শেষে বেতন হয় কি না অথবা কতো বেতন পান তার খবরটা অনেকেই রাখেন না। আর একটি মাসের বেতন এলে তা ওঠানোর জন্য কতো যে কষ্ট করতে হয়, (বিশেষ করে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং সহ-সভাপতির পদ থেকে বাদ দেয়ার সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে) কতোজনের কতো কথা শুনতে হয় তার খবরই বা কে রাখেন? একটি সরকারি সার্কুলারের মর্মার্থ শিক্ষকরা বুঝতে পারেন এমন মনে করা হয় কি না সন্দেহ, সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তারা তার যে অর্থ করেন তাই টু শব্দটি না করে মেনে নিতে হয় এবং সে অনুযায়ী ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তাহলে এখানে কোনো চেতনাশীল লোক থাকলে তার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব কি? এ অবস্থার মধ্যে যাকে থাকতে হয় তার মধ্যে হীনম্মন্যতা জন্মানো কি অস্বাভাবিক? বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এমন ঘটনাও মনে হয় পত্রিকায় দেখেছি- থানায় আসামিকে পুলিশ অন্যায়ভাবে মারধর করেছে- এ ব্যাপারে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ধরনের ঘটনায় ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। যা দেখে অনেকেই আশান্বিত হয়েছেন। অথচ এ শিক্ষকরা এতো ভোগান্তি এবং এতো নাজেহাল হওয়ার পরও তার সামান্যতম খবর পত্রপত্রিকায় আসে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তো দূরের কথা। মনে হয় শিক্ষকতার অপরাধ আসামির চেয়েও বেশি।

এবার এইচএসসি-পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাত্র ৫৯ দিনের মাথায় ফলাফল ঘোষণার যে ব্যবস্থা নেয়া হলো সেটাও কি পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা কারণ কি না তাও ভেবে দেখা দরকার। এইচএসসি পরীক্ষার একটি খাতা মনোযোগ সহকারে দেখতে ১৫ মিনিট লাগার কথা। ঘণ্টায় খাতা দেখা যায় ৪টি। তাহলে কোনো শিক্ষক তার নির্ধারিত ক্লাস এবং অন্যান্য কাজ সারার পর দৈনিক ৩ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে খাতা দেখার সময় পান কি না সন্দেহ। একজন শিক্ষক প্রতিদিন মনযোগ সহকারে দেখলে ১২টির বেশি খাতা দেখতে পারার কথা নয়। তাহলে ১৫ দিনে দেখতে পারেন ১৮০টি খাতা, তারপর আরো আছে বৃত্ত ভরাটের কাজ।

এবার তো স্বল্পতম সময়ে রেজাল্ট দেয়ায় সময় হয়তো এমনিতেই কমে গেছে। এখন শিক্ষকদের খাতা দেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিলে সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপানো কি যুক্তিযুক্ত? অথচ এর জন্য খেসারতটা দিতে হচ্ছে নিরীহ শিক্ষার্থীদের যা কোনো ক্রমেই সমর্থন করার উপায় নেই। আবার এ ব্যাপারে শিক্ষকও কোনো ক্রমেই তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কারণ একজন শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগটাই সবচেয়ে নিবিড়। তিনি জানেন একজন শিক্ষার্থীর কতো কষ্ট, কতো রাত জাগা, কতো আনন্দ-উৎসব থেকে দূরে থাকা, কতো দরিদ্র অভিভাবকের কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে অর্জিত জ্ঞানেরই প্রতিফলন ঘটে পরীক্ষার খাতায়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের তাড়াহুড়া অথবা অন্য কারণে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হলে সেটা সর্বাগ্রে শিক্ষকেরই অনুধাবন করার কথা।

বোর্ডের পরীক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সঙ্গে বোর্ড কর্মচারীদের কাউকে কাউকে টাকা দিতে হয় কি না এবং এ সুযোগে শিক্ষকদের সঙ্গে অযোগ্য শিক্ষকরাও পরীক্ষকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন কি না, যারা নিজের খাতা ছাত্র বা অন্য কারো সাহায্যে মূল্যায়ন করান তারা যোগ্যতার কোন মাপকাঠিতে শিক্ষক বা পরীক্ষক হয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এদের, না নিরীহ ভালো শিক্ষকদের দাপট বেশি এসব বিষয় কেউ কোনো দিন অনুসন্ধান করতে চাইবে না হয়তো।

ভুল যারই হোক একে অনতিবিলম্বে শোধরানোর চেষ্টা করা সবারই কাম্য। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জরুরিভাবেই নেয়া উচিত। আর ব্যবস্থা নিতে গেলে যে কথাটি আসবে সেটি হলো কি ব্যবস্থা নেয়া যায়?

কেউ বলেছেন একই খাতা তিনজন পরীক্ষক দিয়ে মূল্যায়িত করিয়ে গড় নাম্বার দেয়ার জন্য, কেউ বলেছেন বোর্ড কম্পাউন্ডে উত্তরপত্র মূল্যায়ন কেন্দ্র করার জন্য এগুলো ভেবে দেখার মতো প্রস্তাব। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের সর্বস্তরের সৎ, দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিমূলক লোকজন তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। যাতে যে কোনো লোকই তার সামান্য আবেদন নিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছাতে পারে। তাহলে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্র নয় সব ক্ষেত্র থেকেই যাবতীয় অনিয়ম দূরীভূত হবে।

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আরেকটি কথা এসেছে সেটা হলো শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন প্রসঙ্গে। নীতিমালায় বলা আছে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক প্রদত্ত নাম্বার কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। আজকে এ অধ্যাদেশ সংশোধনের কথা বলা হচ্ছে। আসলে অধ্যাদেশটির কারণে অনেক সমস্যা হয়তো হচ্ছে ঠিকই, তবে এটি সংশোধিত বা বিলুপ্ত হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এসব অধ্যাদেশ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। তাই হঠাৎ করে সংশোধন করা হলে এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাত্রা আরো বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় এক সময় পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নামও লেখা হতো, অতঃপর খাতা থেকে পরীক্ষার্থীর নাম বাদ দিয়ে শুধু রোল নাম্বার লেখার নিয়ম হলো, আর বর্তমানে তো পরীক্ষার খাতায় রোল নাম্বারও থাকছে না। এগুলো নিশ্চয়ই পরীক্ষকের ভুল আর অসতর্কতা এড়ানোর জন্য নয় পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হয়তো আরো অনেক কারণ আছে সেগুলো থেকেও পরীক্ষার্থীকে রক্ষা করার জন্য।

আর প্রতি বছর হাজার হাজার পরীক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত নাম্বার না পাওয়া বিষয়ের খাতা চ্যালেঞ্জ করে এ বিষয়টিও সত্য, তবে এ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চবিত্তের সন্তান। কারণ দেশের অনেক স্কুল-কলেজ আছে সেখানকার প্রধানের সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকরা পান না। সেখানে গ্রামের অসহায় দিনমজুর অথবা পিতৃহারা শিক্ষার্থীর খাতা কে যাবে বোর্ডে চ্যালেঞ্জ করতে? কে দেবে তাকে টাকা? তাহলে এমন ব্যবস্থাই আমার মনে হয় নেয়া উচিত যাতে খাতা চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজন বন্ধ করা না গেলেও যেন একেবারেই কমিয়ে আনা যায়। আবার শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী চ্যালেঞ্জ করা খাতাও পরীক্ষার্থী বা তার আত্মীয়স্বজনকে দেখানো যায় না এ নিয়মটিও অনেক অভিজ্ঞতার ফসল। উত্তরপত্র পরীক্ষার্থী বা তার আত্মীয়স্বজনকে দেখালে কিছু সমস্যা হতে পারে। তবে ফটোকপিয়ারের এ যুগে

মূল খাতা না দেখালেও খাতার ফটোকপি পরীক্ষার্থীকে দেখানোর চিন্তা করা যেতে পারে।

শিক্ষকের সামান্য অবহেলা শিক্ষার্থীর জীবনে বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এ কথাটি শিক্ষক কোনোভাবেই ভুলে যেতে পারেন বলে মনে হয় না। আর শিক্ষক সে দায়িত্বে, সততার, কর্ম সম্পাদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত তা সবার আচরণে, মূল্যায়নে, তার পারিশ্রমিক প্রদানে আমাদের অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত বলে মনে হয়।

অসীম কুমার ভৌমিক
শিক্ষক